# হিটলার

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

## ॥ নিবেদন ॥

নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিবাদের পতনের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে যখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী সভাসমিতি, আন্দোলন, আলোচনা হচ্ছে তখন আমার মনে হল ইতিহাসের সত্যসন্ধানী হয়ে খোঁজা উচিত কেমনভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়, তা লালিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। একক ব্যক্তি হিসেবে সর্বনাশা প্রতিভার অধিকারী হিটলার বিশ শতককে যেভাবে আলোড়িত করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ তেমনটি করতে পারেননি। কিন্তু হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি হিটলারি মানসিকতার মৃত্যু হয়েছে? এই মানসিকতার যে মৃত্যু হয়নি তা আমরা প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বের পরিস্থিতির মধ্যে দেখতে পাই। মুখোশের আড়ালে কত খুদে হিটলার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। যথেচ্ছ বাহুবলের সর্বগ্রাসী দাপটের মধ্যে ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রনেতাদের আগ্রাসী চোখরাঙানিতে হিটলারের ছায়া আমরা এখনও দেখতে পাই।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হিটলার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, উগ্র জাতীয়তাবাদের সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রয়োজনের কথা ভেবেই মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে হিটলারের জীবন ও কর্মধারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

হিটলারের জীবদ্দশায় আমাদের দেশেও হিটলারের যথেষ্ট প্রশস্তি গেয়ে বই লেখা হয়েছে। হিটলারের জীবনকে এক আদর্শ, অনুকরণীয় জীবন ভেবে দেবসাহিত্য কুটীর থেকে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৪ যে বই প্রকাশ করেন তাতে তিনি মন্তব্য করেনঃ

"আমাদের এই পরাধীন ভারতবর্ষেও হিটলারের এই আত্মচরিত অবশ্যপাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। কারণ পাশ্চাত্য জগতের সামান্য একজন সৈনিক—বর্তমান সময়ে যে একজন অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিরূপে পৃথিবীতে সুপরিচিত—তাঁহার চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা সর্বতোভাবে আমাদের আদর্শ না হইলেও, তাহাতে যে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক কিছুই নিহিত আছে, সে কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

সামান্য সৈনিক কেমন করিয়া তাহার তরুণ জীবন হইতেই স্বদেশের কথা ভাবিতে শিখিয়াছিলেন—কতভাবে, কত ধারায় তাঁহার চিন্ত াস্রোত প্রবাহিত হইত—তাঁহার যুক্তি, তাঁহার সাহস ও স্বদেশপ্রেম— কেমন করিয়া তাঁহাকে আজ জার্মানির সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—ইহা সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।"*(—বলদর্পী হিটলার/পৃ. ৮১)*

তথ্যের অসম্পূর্ণতায় এ ধরনের বিভ্রান্তি ঘটে। আর হিটলার জয়ী হয়ে গেলে ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যাকাহিনি লুপ্ত হয়ে এমন ধারাতেই হিটলার-প্রশস্তি গাওয়া হত। তাই তথ্যের সম্পূর্ণতা এত জরুরি।

হিটলার লেখার সূচনায় যিনি আমার সব লেখার প্রেরণাদাত্রী তিনিই সব থেকে বেশি বাধা দিয়েছেন। তিনি

আমার স্ত্রী। আমি হিটলারের উপর লেখার জন্য পরিশ্রম করছি দেখে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং এক সময় খেপে গিয়ে বলেন—"অমন একটা নিষ্ঠুর, অমানুষ, যুদ্ধবাদী অহংকারী লোক সম্পর্কে লিখতে তোমার খারাপ লাগবে না?" আমি বললাম—"কিন্তু পৃথিবীতে যে অমন একটা ঘৃণিত লোক ক্ষমতার শীর্ষে উঠে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেটা কি অস্বীকার করতে পারো?" তিনি বললেন—" সেটা ভুলে থাকাই ভালো। তার সম্পর্কে যত কম আলোচনা হয় ততই পৃথিবীর মঙ্গল।" আমি বললাম—'ঠিক উলটোটা, যদি চাও পৃথিবীতে অমন লোক আর শাসনক্ষমতায় না আসতে পারে তবে তার সম্পর্কে ভালো করে জানাটা জরুরি।"

মুখোশ পরে নানা খুদে হিটলার দেশ শাসন করেছে, আজও করছে। সাধারণ মানুষ তাদের মদত দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। ভবিষ্যতেও যে হিটলার জন্ম নেবে না এমন কথা বলা যায় না। আসলে আমাদের সবার মনের মধ্যেই হিটলারি দানব গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকতে চায়—পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ এসবের সহায়তায় তাকে হটিয়ে দিতে হয়।

হিটলারের কোনো মুখোশের প্রয়োজন হয়নি। এখনকার হিটলাররা গণতন্ত্র ও প্রগতির মুখোশ পরে বাস্তব ব্যবহারে হিটলারের থেকে কম যান না। ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কারের অনুষ্ঠানে পরমাণু বোমা সম্পর্কে আলবার্ট আইনস্টাইন যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

"আমরা এই নতুন অস্ত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলাম এইজন্য যাতে এই মানবসভ্যতার শত্রুদের হাতে এই অস্ত্র আগে না পৌঁছে যায় কারণ সেটা হলে, নাৎসিদের মানসিকতা বিচার করে বলা যায়, বাকি পৃথিবীটা ধ্বংস এবং ক্রীতদাসে পরিণত করার সামিল হত।

আমরা এই অস্ত্র আমেরিকা ও ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম ---কারণ তারা শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল। কিন্তু এখন অবধি আমরা শান্তির কোনো গ্যারান্টি পেতে ব্যর্থ হয়েছি।"

*[Daily Telegraph/London/March 14, 2005]*

গ্যারান্টি আজও নেই। তাই ফ্যাসিবাদের পরিবর্তিত নানা রূপের বিরুদ্ধে লড়াইটা জারি রাখা জরুরি। জার্মান মানসিকতার মধ্যে নিশ্চয় কোনো গলদ ছিল নইলে একজন ব্যক্তি এমন ভয়ংকর, এমন অমানবিক, এমন নিষ্ঠুর হতে পারতেন না। আজকের বিশ্বে এমন মানসিকতার শোধন দরকার, যাতে হিটলারের মতো মানুষ রাষ্ট্রকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে না পারে। তাই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিটলারকে জানা প্রয়োজন— এই বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে হিটলার বইটি লেখার চেষ্টা করেছি।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

শ্রীবর্ধন পল্লি
পোঃ জোকা
বাখরাহাট রোড
কলকাতা — ৭০০ ১০৪

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| একটি ধূমকেতুর জন্ম | ..... | ১৫ |
| শিল্পসন্ধানী তরুণ হিটলার | ..... | ২৪ |
| প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিটলার | ..... | ৪৭ |
| রাজনৈতিক মঞ্চে হিটলার | ..... | ৫৮ |
| হিটলারের জীবনে প্রেম | ..... | ৭৪ |
| হিটলারের নির্বাচনী সাফল্য | ..... | ৮৩ |
| ক্ষমতার শীর্ষে হিটলার | ..... | ৯১ |
| বিশ্ব রাজনীতিতে হিটলার | ..... | ৯৯ |
| স্বদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিটলার | ..... | ১০৪ |
| হিটলারি আগ্রাসন | ..... | ১১৪ |
| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের অগ্নি-সংযোগ | ..... | ১২৭ |
| রাশিয়া আক্রমণ | ..... | ১৪৪ |
| হিটলার, মুসোলিনি— দুই ধুরন্ধর দোসর | ..... | ১৬১ |
| হিটলারের চরম পতনের সূচনা | ..... | ১৬৭ |
| হিটলার হত্যার শেষ চেষ্টা | ..... | ১৭৪ |
| হিটলারের সর্বনাশের শেষ সন্ধ্যা | ..... | ১৮৬ |
| হিটলারের জীবনপঞ্জি ও সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা | ..... | ২০২ |

# একটি ধূমকেতুর জন্ম

ইন নদীর তীরে বাবার হাত ধরে একটি ছোট্ট ছেলে বেড়াচ্ছে। বাবা খুব রাশভারি মানুষ। কথা বলেন কম। তবু ছেলেটির সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন খুব ধৈর্য ধরে। যেন কোনো বড়ো মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। ছেলেটির বয়স বছর পাঁচেক কিন্তু তার প্রশ্নের আর শেষ নেই। বাবার মুখে মস্ত এক গোঁফ যেন ঠোঁটের দুদিক দিয়ে দুটো কাঠবেড়ালির লেজ নেমে এসেছে। গলাটাও বাজখাই। মদ্যপানটা একটু বেশি করেন আর তাইতেই মেজাজটা সর্বদা তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তবে আজকের বিকেলে ফুরফুরে বাসন্তী হাওয়ায় বাবার মেজাজটা খুব শান্ত। ছেলেটি আবদার করে বলে, বাবা চলনা নদীটা পেরিয়ে ওপারে যাই। বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ওটা আমাদের দেশ নয়, ওটা জার্মানি। ওটা আমাদের কাছে ভিনদেশ। ছেলেটিরও পালটা প্রশ্ন—আমরা তো জার্মান, তবে ওটা আমাদের দেশ নয় কেন?

—আমরা জার্মান, তবে অস্ট্রিয়ান জার্মান। তাই জার্মান হলেও আমাদের ওদেশের ওপর কোনো অধিকার নেই।

এরপরই একটা গালি দিলেন। কার উদ্দেশে বাবা গালি দিলেন ছেলেটি বোঝে না, তবে চুপ করে যায়। বাবার মেজাজ যে খারাপ হয়েছে, তা সে বুঝতে পারে।

নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চুপচাপ দু-জনে অনেকটা পথ চলে এসেছে। প্রকৃতি বড়ো মনোরম। শান্ত নদীটির ওপারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ছেলেটি। ওদেশের লোকও জার্মান, আমরাও জার্মান, তবু কেন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না, একথার উত্তর নিজের মনেই খোঁজে ছেলেটি।

অস্ট্রিয়ার সীমান্তবর্তী ব্রাউনাউ নামে ছোট্ট শহরের শহরতলিতে ছেলেটি জন্মেছে। তাই অস্ট্রিয়া তার জন্মভূমি। একদিন ছেলেটির বাবা তাকে একটি স্ট্যাচুর সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন— এ কে জান?

জানে না, ছেলেটি মাথা নাড়ে। তবে জানবার ইচ্ছা খুব। বাবা গভীর আবেগের সঙ্গে তাঁর ছেলেকে বোঝাতে থাকেন—

এর নাম জোহানেস ফিলিপ পাম। তুমি তো নেপোলিয়নের নাম শুনেছ। সেই ফরাসি সম্রাট জোর করে জার্মানিদের ব্যাভেরিয়া কেড়ে নেন। সে বড়ো দুঃসময়। জোহানেস পাম জার্মানিদের সেই "চরম লাঞ্ছনার" কথা লেখা একটি ইস্তেহার বিলি করেন। সে ১৮০৬ সালের কথা। নেপোলিয়নের সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে

জানতে চায়, ঐ লোক- খেপানো ইস্তাহার কে লিখেছে। কিন্তু পাম কিছুতেই নাম ফাঁস করবে না। খাঁটি জার্মান রক্ত তার ধমনিতে বইছে। চরম অত্যাচারেও সে মুখ খুলল না। নেপোলিয়ন হুকুম দিলেন, ওকে গুলি করে মার। ফরাসি সেনার গুলিতে পামের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। সে প্রাণ দিল কিন্তু জার্মান জাতির মান রাখল। তারই মূর্তি ওইটে। এইখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

ছোট্ট ছেলেটি বাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে জোহানেস পামকে শ্রদ্ধা জানাল। এতটুকু বয়সেই ছেলেটির অন্তরে এক গভীর জাত্যভিমান গড়ে উঠেছে। এরপর যখনই সে তার জন্মভূমি ব্রাউনাউতে ঐ পথে এসেছে গভীর শ্রদ্ধায় জোহানেস পামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছে।

এই ছেলেটিই পৃথিবীর ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘৃণিত চরিত্র এডলফ্ হিটলার, যার নির্দেশে ষাট লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খলনায়ক এডলফ্ হিটলার।

ফরাসি বিপ্লবের ঠিক একশো বছর পরে, ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল উত্তর অস্ট্রিয়ার ইন্ নদীর তীরে ব্রায়ুনাউ শহরে সন্ধের সময় হিটলার এক পান্থশালায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা এলইস্ হিটলার, মা ক্লারার থেকে তেইশ বছরের বড়ো। মা ক্লারা হিটলারের বাবার তৃতীয় স্ত্রী। হিটলার তার মার চতুর্থ সন্তান। দুই পুত্র এক কন্যা অল্প বয়সেই মারা যায়। মা ক্লারা হিটলারকে খুব ভালোবাসতেন আর হিটলারও ছিলেন মা-অন্ত প্রাণ। বাবার স্বভাব ছিল ভীষণ কড়া প্রকৃতির। অসম্ভব মদ

খেতেন। বদমেজাজি মানুষ। ছেলেমেয়েদের পেটাতে তাঁর হাত সর্বদাই নিশপিশ করত। এলইসের বাবা কে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি এক ইহুদির অবৈধ সন্তান। তা হলে হিটলারের রক্তে ইহুদি রক্ত মিশেছে! তবে অনেকে মনে করেন এলইস্-এর সত্যিকারের বাবা জোহান হুটলার। তিনি ছিলেন একজন সম্পন্ন কৃষক। জোহান হুটলার তাঁর কাকা এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে ১৮৭৬ সালে এলইস্ নিজের পদবি হিটলার গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি তাঁর মা'র পদবি গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৯-এর ২২ এপ্রিল হিটলারের ধর্মীয় নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। হিটলারের এক ভাই জন্মায় ১৮৯৪-তে। তার নাম এডমন্ড। এডমন্ড মাত্র ছ-বছর বয়সে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান-হামে মারা যায়। হিটলারের বাবা একজন কাস্টমস অফিসার ছিলেন। ১৮৯২-তে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি ব্রাউনাউ ছেড়ে পাসুতে (Passau) চলে আসেন। এর দু'বছর পর তিনি অস্ট্রিয়ার উত্তরে সুন্দর শহর লিন্জ্-এ এসে কাজে যোগ দেন।

লিন্জ্ হিটলারের বড়ো প্রিয় শহর। দানিউব নদীর তীরে এই ছোট্ট ছবির মতো শহরটির মায়ায় হিটলার সারা জীবন এমন মোহিত ছিলেন যে লিনজ্কেই তিনি নিজের প্রকৃত জন্মস্থানের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। হিটলার তাঁর আত্মজীবনী "মাইন ক্যাম্ফ"-এ বলেছেন, তিনি ভবিষ্যতে যা হয়েছেন তার গোড়াপত্তন হয়েছে লিন্জ্ শহরে। ১৮৯৯ অবধি হিটলার স্থানীয় বিদ্যালয়ে

পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ শেষ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে হিটলার অস্ট্রিয়ার লিন্‌জের স্টেইনগাস্‌-এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

হিটলার ছোটোবেলায় পড়াশুনায় ভালোই ছিলেন। যে বিষয়গুলি তাঁর প্রিয় সেগুলো খুব মন দিয়ে পড়তেন কিন্তু যে বিষয়গুলি ভালো লাগত না তা ভীষণ অবহেলা করতেন, ফলে কখনো পরীক্ষার ফল ভালোই হত, কখনো খারাপ। হিটলারের বাবার ইচ্ছে হিটলার বড়ো হয়ে একজন সরকারি চাকুরে হোক। কিন্তু হিটলারের ইচ্ছা সে হবে একজন নামি চিত্রশিল্পী। তাই খুব মন দিয়ে ছবি আঁকতেন, ছবি আঁকা তাঁর খেয়ালচর্চা নয়। রীতিমতো জীবিকা অর্জনের জন্য শিল্পকেই আঁকড়ে ধরতে চান। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। বাবার কড়া শাসনে মানুষ হয়েও ছোটোবেলা থেকেই হিটলার বাবার মতো গোঁয়ার্তুমিতে ছিলেন এক নম্বর। বাবা চাইলেও তিনি সরকারি কর্মী হবেন না। ফলে তিনি ইচ্ছে করেই ভালো না-লাগা বিষয়গুলি পড়াই ছেড়ে দিলেন। পরীক্ষার ফল খারাপ হল। তাতে হিটলারের কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। ১৯০৫ সালে জার্মান, ফরাসি, অঙ্ক আর স্টেনোগ্রাফিতে ফেল করে বসলেন। নিজেই হিটলার আত্মজীবনীতে বলেছেন— এর কারণ বাবার অবাধ্য হয়ে বাবার উপর প্রতিশোধ নেওয়া, সেই সঙ্গে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা। লক্ষ্য চিত্রশিল্পী হওয়া। দিনরাত ছবি আঁকেন। আঁকাতে ঝোঁক মূলত স্থাপত্যচিত্রে। নবম শ্রেণি অবধি টেনেটুনে উত্তীর্ণ হওয়া গেল কিন্তু তারপর ফল হল